শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

সুরেশঃ শরণং শর্ম বিশ্বরেতাঃ প্রজাভবঃ।
অহঃ সংবৎসরো ব্যালঃ প্রত্যয়ঃ সর্বদর্শনঃ ॥ ২৩

শাংকরভাষ্য : সুরাণাং দেবানামীশঃ *সুরেশঃ* সুপপদো বা রাধাতুঃ শোভনদাতৃণামীশঃ সুরেশঃ। আর্তানামার্তিহরণত্বাৎ *শরণং*।

পরমানন্দরূপত্বাৎ *শর্ম*।

বিশ্বস্য কারণত্বাৎ *বিশ্বরেতাঃ*।

সর্বাঃ প্রজা যৎসকাশাদুদ্ভবন্তি স *প্রজাভবঃ*।

প্রকাশরূপত্বাদ্ *অহঃ*।

কালাত্মনা স্থিতো বিষ্ণুঃ *সংবৎসর* ইত্যুক্তঃ।

ব্যালবদ্ গ্রহীতুমশক্যত্বাদ্ *ব্যালঃ*।

প্রতীতিঃ প্রজ্ঞা *প্রত্যয়ঃ* 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঐতরেয়োপনিষৎ ৩।৫।৩) ইতি শ্রুতেঃ।

সর্বাণি দর্শনাত্মকানি অক্ষীণি যস্য স *সর্বদর্শনঃ*, সর্বাত্মকত্বাৎ; 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' (শ্বেতাশ্বতর ৩।৩) 'বিশ্বাক্ষং' (নারায়ণোপনিষৎ ১৩।১) ইতি শ্রুতেঃ।

ভাবানুবাদ : ভূমার প্রতি জিজ্ঞাসা কীভাবে হয়? শাস্ত্র স্পষ্ট দ্বিধাহীন ভাষায় উত্তর দিয়েছেন, 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক'। জীবনযাপনের নৈতিক শুদ্ধতাই জীবকে নিয়ে যায় অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার উত্তরণে। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যমুনি বলেছেন, 'সৎকর্মপরিপাকাৎ'—কর্মশুদ্ধির ফলস্বরূপ। এই প্রসঙ্গেই এসে যায় প্রাণের শুদ্ধির কথা। অসুঃ (অস্ উন্) শব্দের অর্থ শ্বাস বা প্রাণ। প্রাণ যত শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, ততই তা পবিত্রতাস্বরূপ, সত্যসুন্দর ঈশ্বরের পথেই যায়। প্রাণ যত দেহের, ইন্দ্রিয়ের বা ভোগের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তত তা অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। "অসুষু প্রাণেষু রমন্তে ইতি অসুরাঃ।" অনিয়ন্ত্রিত মন, উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ তথা অন্তঃকরণের বশীভূত প্রাণীই অসুর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান ওই আচরণশুদ্ধির জন্য চব্বিশটি গুণের উল্লেখ করে বলেছেন, ওইগুলির অনুশীলন করলে দৈবীসম্পদের বিকাশ হয়: "ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত" (১৬।১,২,৩)। ওইসব দৈবীগুণসম্পন্ন মানুষের প্রশংসা করে বলেছেন, এই দৈবীসম্পদ মুক্তির এবং আসুরীসম্পদ সংসারে বন্ধনের হেতু। এই ভাষাতেই পিতামহ ভীষ্ম নারায়ণকে ডেকেছেন 'সুরেশ' সম্বোধনে। অর্থাৎ নারায়ণ সুরের (দেবতার) ঈশ্বর, দেবের ধন—'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'। মদনমোহনাষ্টকমে যেমন রয়েছে "জয় ধীরধুরন্ধর অদ্ভুতসুন্দর দৈবতসেবিত

দেহি পদম্।" দিব্যতার মধ্য দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়।

অপরপক্ষে দেহাসক্ত প্রাণের তীব্র নিন্দা করে শ্রীভগবান বলেছেন, মূঢ় অবিবেকী জীবনই আসুরী। বলেছেন, অধম এদের জীবন, ব্যর্থ— "আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।/ মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।" (গীতা, ১৬।২০) স্বামী বিবেকানন্দ তাই বারবার বলেছেন, "Religion is the manifestation of divinity already in man." বলেছেন, "Each soul is potentially divine."

আমরা গীতাধ্যানে পাই, ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ দিব্যস্তব দ্বারা যাঁর স্তুতি করেন, বেদ যাঁর মহিমা গান করেন, যোগিগণ যাঁকে ধ্যানে দর্শন করেন, সীমাতীত অন্তহীন সেই দেবকে প্রণাম :

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-/ র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ॥/ ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো/ যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥"

শৃধাতু থেকে শরণ শব্দের উৎপত্তি (শৃ+ল্যুট)। যিনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন, তিনি 'শরণ' উচ্চারণের বাচ্য। ভাষ্যকার বলেছেন, আর্তগণের আর্তি হরণ করেন বলে তিনি শরণ। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্... আর্তো জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী।" বহু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিতে যে-মানুষ ঈশ্বরের শরণ নেয়, তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় ভিক্ষা করে, তাদের মধ্যে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারণ করেছেন 'আর্ত' জনের নাম। তাপদগ্ধ, সংকটাপন্ন প্রাণী যখন কাতরভাবে ঈশ্বরের শরণ নেয়, তখন তার তীব্রতা ঈশ্বরের আসন টলিয়ে দেয়। কৌরবের রাজসভায় অপমানে বিধ্বস্ত দ্রৌপদীর প্রার্থনায় শুনতে পাই সেই আর্তি, সেই সমর্পণ :

"হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন/ কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন।/ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন/ প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥" (মহাভারত, সভাপর্ব, অধ্যায় ৬৫) এই প্রাণের বেগ, এই আর্তিই প্রাণীকে ঈশ্বরের শরণে নিয়ে যায়, কারণ তিনিই "গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।"

শ্রীশ্রীমাকে তাঁর জনৈক সন্তান ঈশ্বরলাভ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, "এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও।"

গীতার অন্তিম শ্লোকগুলিতে শুধু ভগবানের প্রতি শরণাগতির কথাই বলা হয়েছে :

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(১৮।৬৩, ৬৫, ৬৬)

শর্ম—পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সৎ-চিৎ-আনন্দ দ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করা হয়, তাঁর লক্ষণ করা হয়। জীব নিজ অজ্ঞানের জন্য অসদ্বস্তুতে সদ্ভাবনা করে বা জড়বস্তুতে চৈতন্যভাবনা করে (অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ করে, অর্থাৎ যা নয় তাকে তাই ভেবে) আনন্দ পায়। জ্ঞানী ভক্ত অসৎ এবং অচিৎ বস্তুর বন্ধন ছাড়িয়ে তাঁকে পরম আনন্দরূপে পেতে চায়। নারদীয় ভক্তিসূত্রে পাই,

১। সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা

২। অমৃতস্বরূপা চ

৩। যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি (সূত্র ২,৩,৪)।

পরিমাণগতভাবে এবং গুণগতভাবে যে-আনন্দ সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ, তাই পরমানন্দ। তিনি পরমানন্দস্বরূপ, তাই তিনি শর্ম নামের অধিকারী। শর্ম শব্দটিও শৃধাতু থেকে উৎপন্ন (শৃ+মণিন্)। অর্থাৎ যে-চরণে আশ্রয় পেলে জীব আনন্দে থাকে, শান্ত থাকে, পরিতৃপ্ত হয়, সেই সুরক্ষিত, আনন্দময় আশ্রয়টি শর্মরূপী। "সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব গোষ্পদবারি যথায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, জগতে যতরকমের আনন্দ আছে, ঈশ্বরানন্দের কাছে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে সেই অনাবিল আনন্দের অভিব্যক্তি। পুরীর গম্ভীরাতে যখন শ্রীচৈতন্যদেব বিরাজ করছেন, সেইসময় তাঁর ঈশ্বরানন্দে যাপিত জীবনের চিত্র পাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। অর্ধোন্মাদের মতো নিত্য প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে প্রভু দিন কাটাতেন : "এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে/ প্রেমসিন্ধু মগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে।" (অন্ত্যলীলা, পরিচ্ছেদ ১৯)

এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে এসেছেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পুষ্পশোভিত উদ্যানে এসে প্রভুর মন আনন্দে পরিপূর্ণ। এক অশোকবৃক্ষতলে ভাবনয়নে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। উদ্যানের বাতাস ভারি হয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভে। জ্ঞান ফিরে এলে প্রভু উত্তেজনায় পাগলের মতো আচরণ করছেন, আবৃত্তি করছেন 'গোবিন্দলীলামৃতে'র সেই শ্লোক যা কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ শ্রীরাধা সখীগণকে শুনিয়েছিলেন। সমস্ত রাত্রি প্রভু এমনই এক অর্ধবাহ্যদশায় দিব্যানন্দে কাটালেন। ভোর হল, স্বরূপদামোদর নানাভাবে প্রভুকে ভুলিয়ে গম্ভীরাতে নিয়ে এলেন। (তদেব)

দুশো বছরও হয়নি, শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এই ধরাধামে। ভগবদানন্দে তাঁর পা টলমল করত। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' পাই, ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনাদি করে ফিরছেন, পা টলছে। রাস্তায় সাধারণ মানুষ তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে নিজেরা বলাবলি করছে, "উঃ! লোকটা কি মাতাল হয়েছে হে!"

দক্ষিণেশ্বরে তিনি একদা বিষ্ণুমন্দির থেকে ফেরার সময় লীলাপ্রসঙ্গকারের বর্ণনা : "একেবারে যেন পুরোদস্তুর মাতাল! চক্ষু রক্তবর্ণ, হেথায় পা ফেলিতে হোথায় পা পড়িতেছে, কথা এড়াইয়া অস্পষ্ট অব্যক্ত হইয়া গিয়াছে...।" শ্রীশ্রীমা তাঁর নিজস্ব ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবস্থাকে বলেছেন মা কালীর 'ভাবামৃত' পানের ফল। নারদীয় ভক্তিসূত্রের বাক্যগুলিকে যেন আক্ষরিকভাবে মিলিয়ে নেওয়া যায়—"যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।"

কেন তিনি পরমানন্দের আকর? কারণ তিনিই আমাদের স্বরূপ, আমাদের সকলের আত্মা। বৃহদারণ্যক উপনিষদ (২।৪।৫) বলছেন, "ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।" কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জগতে বিচরণকারী মানুষ অর্থাৎ প্রাকৃত মানুষ ওই আনন্দের আস্বাদন করা বা বোধে বোধ করা তো দূরের কথা, বুদ্ধি দিয়ে তার নাগালও পায় না। দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মবোধে বোধ করায়, দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতেই মানুষের তীব্র আসক্তি এসে পড়ে। নিত্যশুদ্ধ আনন্দঘন আত্মবোধ ধারণার অতীত এক তত্ত্বরূপেই থেকে যায়।

ধী-শক্তি যত পরিণত হয়, গভীর হয়, ততই জীবজগৎ কারণের অনুসন্ধান করতে থাকে। তাই 'আর্ত' মানুষের পরবর্তী স্তর 'জিজ্ঞাসু'। পিতামহ নারায়ণকে সম্বোধন করেছেন 'বিশ্ববেত্তা' নামে। 'আশ্রয়-বিষয়' তত্ত্বরূপে নারায়ণকে সম্বোধন করা হচ্ছে যে তিনিই শরণ (আশ্রয়), তিনিই শর্ম (আনন্দ), তিনিই বিশ্বের কারণ, বিশ্বরেতা। আমরা

সকলে তাঁর সন্তান, তাঁর দাস, তাঁর প্রজা। তিনি আশ্রয়তত্ত্ব, আমরা আশ্রিত (বিষয়তত্ত্ব)। এই আশ্রয়-বিষয়কে কেন্দ্র করেই তাঁর নিরন্তর লীলাবিলাস—সৃষ্টিস্থিতিলয় রূপ কার্য চলেছে। তাই 'বিশ্বরেতা' এবং 'প্রজাভব' দুটি সম্বোধন পরস্পরের পরিপূরক।

ভাষ্যকার বলছেন, বিশ্বের তিনি কারণ, তাই বিশ্বরেতা। ভগবদ্‌গীতার সর্বত্র দেখতে পাই শ্রীভগবানের স্বীকারোক্তি : "বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।" (৭।১০)—হে পার্থ, আমাকেই সমস্ত ভূতের সনাতন কারণ বলে জানবে। "এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।" (৭।৬)—আমারই প্রকৃতি থেকে সর্বভূতের উৎপত্তি।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে॥"
(৯।১০)

—হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতা দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। আমার কারণেই এই সংসারচক্র আবর্তিত হয়।

গীতায় অর্জুনের কণ্ঠেও পাই এই স্তুতি :

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥" (১১।৩৮)

—হে অনন্তরূপ, আপনি আদিদেব ও অনাদিপুরুষ এবং বিশ্বের পরম প্রলয়স্থান। যা কিছু বেদ্য, তৎসমূহের বেদিতাও আপনি। যা কিছু বেদ্য, তা-ও আপনি। আপনি পরম ধাম এবং আপনিই জগতকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন।

"পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
তমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥" (১১।৪৩)

—হে অমিতপ্রভাব, আপনি এই চরাচর জগতের স্রষ্টা, পূজ্য, গুরু, তাঁরও গুরু। অতএব ত্রিভুবনে আপনার সমান আর কেউ নেই। ত্রিভুবনে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে-ই বা হতে পারে?

ভাষ্যকার বলছেন, সমস্ত প্রজা (জগতের সমস্ত প্রাণিবর্গ) যাঁর থেকে উৎপন্ন তিনিই প্রজাভবঃ। শ্রীভগবান বলছেন (৫।২৯),

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥"

—কর্তা এবং অধীশ্বররূপে আমি সর্বপ্রাণীর সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা। আমি সর্বলোকের মহেশ্বর, সমস্ত ভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ। এইরূপে আমাকে জেনে যোগী শান্তি এবং মুক্তি লাভ করে।

পরবর্তী চরণে এই 'জগৎকারণ' নারায়ণের চারটি বিভূতির উল্লেখ করছেন পিতামহ ভীষ্ম। তিনি অহঃ—প্রকাশস্বরূপ, তিনি সংবৎসর অর্থাৎ কালস্বরূপ। তিনি ব্যাল যেন শেষনাগ, তিনি প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। শ্রীভগবান বলেছেন (গীতা ১৫।১২), "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" —সূর্যের যে-জ্যোতি জগতকে প্রকাশিত করে, এবং চন্দ্রমা ও অগ্নির মধ্যে যে-জ্যোতির উদ্ভাস, তা আমারই। শ্রুতিও বলেছেন, "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" (কঠ ২।২।১৫)—তাঁর জ্যোতিতেই সমগ্র জগৎ প্রকাশিত। তাই তিনি অহঃ—সব জ্যোতির জ্যোতি (জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ, গীতা ১৩।১৮)। ভগবান স্বমুখেই বলেছেন, 'কালঃ কলয়তামহম্' (গীতা ১০।৩০), অথবা 'অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ'—আমিই অক্ষয়কাল বা কালাতীত, আবার আমিই ক্ষণ, আমিই কাল বা পরিণাম হিসেবে কার্য-কারণ হেতু। প্রধানত সূর্যকে অবলম্বন করেই কাল গণনা করা হয়। ভগবান বলছেন, সূর্য তাঁরই জ্যোতি। আবার মহাপ্রলয়ে যখন সূর্যও লীন হয়ে যায় (মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মারও

আয়ু শেষ হয়ে যায়) তখনও আমিই থাকি, তাই আমিই অক্ষয় কাল। পিতামহ ওই পরিপ্রেক্ষিতে নারায়ণকে সম্বোধন করেছেন 'সংবৎসর' নামে।

কালের অপর অর্থ ধ্বংস বা প্রলয়। ভয়ংকর অর্থেও কাল শব্দকে ব্যবহার করা হয়। অর্জুনের একটি দর্শনের কথা এই অনুষঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে বিশ্বরূপ দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণের করাল বিকটরূপ দেখে অর্জুন কাতরস্বরে বলছেন, ''আপনার 'কালানলসন্নিভ' অর্থাৎ প্রলয়াগ্নির মতো ভয়ংকররূপ দেখে আমি শান্তি পাচ্ছি না, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।'' এখানে 'কাল-অনল' বা কাল-শব্দের ব্যবহার ধ্বংসের সমার্থক। নারায়ণের এই ভয়ংকর রূপের ভাবনা নিয়েই পিতামহ তাঁকে সম্বোধন করলেন 'ব্যাল' নামে। 'ব্যাল' শব্দের বুৎপত্তি—বি+আ+অল্+অচ। অল্ধাতুর সঙ্গে অচ্ প্রত্যয়যোগে উৎপন্ন ক্রূরতাবাচক, হিংস্রতাবাচক শব্দ 'ব্যাল'। ভাষ্যকার বলছেন, তিনি সর্পের মতো দুর্ধর্ষ, মত্ত হস্তীর মতো আয়ত্তের অতীত।

এগুলি ঈশ্বরের অসীম, অকল্পনীয় সত্তার আভাস। তিনি প্রাকৃত মনের অগোচর, বিষয়ী ইন্দ্রিয়াসক্ত মন তাঁকে ধারণা করতে অক্ষম—এসব বোঝানোর জন্যই এই স্বপ্রকাশ, কালাতীত, কালস্বরূপ ব্যাল ইত্যাদি নামের উচ্চারণ। তাহলে তিনি কি প্রকৃতই অধরা? তিনি কি ধ্যানধারণার অতীত কোনও বস্তু? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি অবাঙ্মনসোগোচর নন, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা সমার্থক। তাই ব্যতিরেক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি 'ব্যাল'—এই নাম উচ্চারণ করেই, পিতামহ ইতিবাচক বা অন্বয়মুখে বললেন, তিনি 'প্রতীতি'। তিনি 'অভাব'তত্ত্ব নন, তিনি 'ভাব'তত্ত্ব। তাঁকে ধারণা করা সম্ভব, তিনি ধ্যানগম্য। 'প্রতীতি' পদ ই-ধাতু থেকে উৎপন্ন। প্রতি+ই+ক্তিন্। ই-ধাতু ধারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষ্যকার বলছেন, প্রতীতি মানে প্রজ্ঞা, প্রত্যয়। ভাষ্যকার ঐতরেয় উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (৩।৫।৩)।

ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে আচার্য শংকর যে-বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সংজ্ঞা দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে তা অনুধাবন করা যায়। ভাষ্যকার বলছেন, সেই প্রজ্ঞা যা সম্পূর্ণ শুদ্ধ, সমস্ত উপাধির বিশেষতা থেকে মুক্ত, নিত্যনিরঞ্জন, নির্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক এবং অদ্বয়। সেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকেই পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন 'প্রত্যয়'।

পরিশেষে পিতামহ বলছেন, ''হে যুধিষ্ঠির, তাঁর দৃষ্টির বাইরে কিছুই নেই, তিনি 'সর্বদর্শন'—সম্পূর্ণ সৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, যিনি সর্বাত্মক।'' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভাষ্যকার :

''বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো।
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ॥'' (৩।৩)

নারায়ণ উপনিষদের উদ্ধৃতি এনে ভাষ্যকার বলেছেন, ''সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্'' (২৩।১)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শুনতে পাই এর প্রতিধ্বনি (১৩।১৬) :

''বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥''

—সমস্ত ভূতের অন্তরে বাহিরে চরাচরে সর্বত্র তিনি বিরাজিত। অতিসূক্ষ্ম বলে তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানীর অজ্ঞাত বলে অতি দূরে এবং আত্মস্বরূপে জ্ঞাত বলে জ্ঞানীর অতি নিকটে। *(ক্রমশ)*